

ফাতওয়া

পার্লামেন্ট-সংসদ ও
সংসদ সদস্যদের বিধান

শাইখ আলি ইবনু খুদাইর আল-খুদাইর



উস্তায মাহমুদ আযহার অনূদিত

পার্লামেন্ট-সংসদ ও সংসদ সদস্যদের বিধান

শাইখ আলি ইবনু খুদাইর আল-খুদাইর

[উস্তায মাহমুদ আযহার অনুদিত]



১৪৪৬ হিজরি - ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي استوى على عرشه بائن عن خلقه وهو رب العرش العظيم ، والصلوة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد :

সংসদ কুফর ও শিরকের আখড়া। আর তা বৈধ (স্থান) নয়। আমাদের মতে সংসদ হলো তাগুত; কেননা তা আইন প্রণয়ন ও নিয়ম-কানুন প্রবর্তন এবং মানবরচিত আইনে বিচার ফায়সালা করার জায়গা। আর নিশ্চয়ই গণতন্ত্র ও সংসদের মূল ভিত্তি হলো- “জনগণের জন্য জনগণের তৈরি করা শাসন।” জনগণই মূলত তাদের প্রতিনিধিদের মাধ্যমে আইন প্রণয়ন করে, যাদের কে তারা পার্লামেন্ট মেম্বার বা সংসদ সদস্য নামে নামকরণ করে। আর তা আইন প্রণয়ন করা, বিচার ফায়সালা করা ও আল্লাহ তা’আলার আদেশ এবং নিষেধের ক্ষেত্রে আল্লাহ তা’আলার একত্ববাদের সাথে সাংঘর্ষিক। (অর্থাৎ বিধান দানে ও বিচারকার্যে এবং বিধিনিষেধ আরোপের ক্ষেত্রে আল্লাহ তা’আলা যে এক ও অদ্বিতীয়, এ ক্ষেত্রে তাঁর কোনও অংশীদার নেই-এসব বিষয়ের সাথে বিরোধপূর্ণ। এক কথায় তা তাওহীদুল হাকিমিয়াতের সাথে সাংঘর্ষিক)।

অথচ আল্লাহ তা’আলা বলেন-“

إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ

বিধানদাতা একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা’আলা।”-সূরা ইউসুফ, আয়াত : ৪০।

তিনি আরও বলেন-“

أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ

তবে কি তারা জাহিলিয়াতের শাসনব্যবস্থা প্রত্যাশা করে? আর বিশ্বাসী কওমের

জন্য বিধান প্রদানে আল্লাহর চেয়ে কে অধিক উত্তম?”-সূরা মায়িদা, আয়াত : ৫০।

আরেক আয়াতে আল্লাহ তা’আলা বলেন-“

ولا يشارك في حكمه أحدا

তিনি তাঁর বিধান বা সিদ্ধান্তে কাউকে অংশীদার বানান না।”-সূরা কাহফ, আয়াত : ২৬।

বিধান দানে না তিনি সংসদ সদস্যদের অংশীদার বানান, আর না জনগণকে অংশীদার বানান, আর না অন্য কাউকে অংশীদার বানান।

“কোনো ব্যক্তি, পরিবার, সম্প্রদায়, দল, সংগঠন কিংবা রাষ্ট্রের জনগণের জন্য আল্লাহ তা’আলার হাকিমিয়াহ তথা শাসনক্ষমতায় কারও কোনও অংশ ও অংশীদারিত্ব নেই। বরং তা একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা’আলার একক বৈশিষ্ট্য ও তাঁর নিজস্ব কর্ম। এতে অন্য কারও অধিকার নেই। আর নিশ্চয়ই তিনি প্রকৃত হাকিম তথা শাসক ও বিচারক। প্রকৃত প্রভাব ও কর্তৃত্ব একমাত্র আল্লাহ তা’আলার জন্যই সুনির্দিষ্ট ও সুনির্ধারিত। পৃথিবীতে যত বাসিন্দা রয়েছে, তারা কেবল তাঁর মহান রাজত্বের অতি সাধারণ প্রজা ও গোলাম।

অধিকন্তু আল্লাহ তা’আলা ছাড়া অন্য কারও জন্য আইন প্রণয়নের কোনও অধিকার ও ক্ষমতা নেই। সমস্ত মুসলমান, কিংবা রাষ্ট্রের সকল জনগণের জন্যেও আইন প্রণয়ন করার অনুমতি নেই। যদি তারা পরস্পর পরস্পরের সহযোগী হয়, কিংবা তারা সবাই মিলে কোনো একজনকে দায়িত্বও দেয়, তবুও কেউ কোনো আইন প্রণয়ন করতে পারবে না। এমনকি আল্লাহ তা’আলা কর্তৃক তাদের জন্য বিধিবদ্ধ করা বিধানে সামান্যতম পরিবর্তনও আনতে পারবে না।

ইসলামী রাষ্ট্রের ভিত্তি কেবল সেসব বিধিবদ্ধ আইনকানুনের উপরই প্রতিষ্ঠিত ও স্থাপিত হবে, যা আল্লাহ তা’আলা থেকে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

নিয়ে এসেছেন; যতোই পরিবেশ-পরিস্থিতি ও সেসব সরকারের পরিবর্তন হোক—
যাদের হাতে রাষ্ট্রের লাগাম ও কর্তৃত্ব, তবুও অন্য কোনো আইনের উপর রাষ্ট্রের
ভিত্তি স্থাপন করা যাবে না। মানুষ কেবল সে সরকার ও প্রশাসনের আনুগত্য
করবে, যারা কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী বিচার ফয়সালা এবং রাষ্ট্র পরিচালনা
করে। আল্লাহ তা'আলার আইন তাঁর সৃষ্টির মাঝে বাস্তবায়ন করে। উপর্যুক্ত
বক্তব্যের প্রমাণ হিসেবে আল্লাহ তা'আলার বাণী বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

আল্লাহ তা'আলা বলেন—

وما أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا
أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا
عِنْدَ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ اللَّهُ تَوَابًا رَحِيمًا
بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيَسْلَمُوا تَسْلِيمًا

আমি কেবল এজন্যই রাসূল প্রেরণ করেছি যে, আল্লাহ তা'আলার আদেশের
প্রেক্ষিতে তাদের অনুসরণ করা হবে। আর যদি তারা—যখন নিজেদের উপর
জুলুম করেছিল, তখন তারা আপনার কাছে আসতো, অতঃপর আল্লাহ তা'আলার
কাছে ক্ষমা চাইতো, এবং রাসূলও তাদের জন্য ক্ষমা চাইতো, তাহলে অবশ্যই
তারা আল্লাহ তা'আলাকে তাওবা কবুলকারী ও দয়াময় হিসেবে পেত। অতএব
আপনার রবের কসম, তারা কক্ষনো মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না তারা
তাদের বিবাদমান বিষয়ে আপনাকে বিচারক নির্ধারণ করে। অতঃপর আপনি যে
ফয়সালা দেন, সে ফয়সালা নিঃসঙ্কোচে, নির্দিধায় ও সন্তুষ্ট চিত্তে মেনে নেয়।”—
সূরা নিসা, আয়াত : ৬৪-৬৫।

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম ইবনু কাসীর [মৃত্যু: ৭৭৪ হিজরী] রাহিমাহুল্লাহ
বলেন—“আল্লাহ তা'আলা তাঁর পবিত্র ও সম্মানিত সত্তার কসম করে বলেন যে,
কোনও ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হিসেবে বিবেচিত হবে না, যতক্ষণ না সে তার

সকল বিষয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শাসক ও বিচারক হিসেবে গ্রহণ করে। আর তিনি যা ফয়সালা করেন- তা এমন সঠিক ও যথার্থ ফয়সালা, যার সামনে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আত্মসমর্পণ করা ওয়াজিব।”- অনুবাদক।

যারা বলেন যে, গণতন্ত্র এবং সংসদের ভিত্তি (ইসলামের রীতি) ‘শূরা’ তথা পরামর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাদের কথা হয়তো মিথ্যা ও বিভ্রান্তিকর, নয়তো মূর্খতা ও ভ্রষ্টতায় পরিপূর্ণ। গণতন্ত্র ও সংসদের ভিত্তি শরয়ী ‘শূরা’র উপর প্রতিষ্ঠিত নয়; বরং তা তাশরী তথা আইন প্রণয়নের উপর প্রতিষ্ঠিত। সংসদ সদস্যরা পরস্পরে কোনো বৈধ বিষয়ে পরামর্শ করে না; বরং তারা পরামর্শ করে যাতে তারা এমন আইন প্রণয়ন করতে পারে, যা শরীআতের সাথে সাংঘর্ষিক ও বিরোধপূর্ণ। আর এটাই তাদের প্রকৃত অবস্থা ও অনস্বীকার্য বাস্তবতা।

“ইসলামের শূরা বা মাশওয়ারা তথা পরামর্শ পদ্ধতির সাথে গণতান্ত্রিক নির্বাচন ও সংসদ সদস্যদের কর্মকাণ্ডের কোনো মিল নেই। একটা আরেকটার সাথে সম্পূর্ণ বিরোধপূর্ণ ও সাংঘর্ষিক। শরীআতের দৃষ্টিতে মাশওয়ারা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি আমল। ফুকাহায়ে কিরামের কেউ কেউ বলেছেন, মাশওয়ারা করা ওয়াজিব। আর কেউ কেউ বলেছেন, সুন্নাত। পক্ষান্তরে কুফরি গণতন্ত্র ও কুফরি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার অবিচ্ছেদ্য অংশ ‘নির্বাচন’ এবং ‘সংসদ’ হলো হারাম, কুফর ও শির্ক। ইসলামে খলিফা নির্বাচনের ক্ষেত্রে পরামর্শ গ্রহণ করা হয় ‘আহলুল হল্লি ওয়াল আকদ’ তথা বিজ্ঞ, প্রাজ্ঞ, তাকওয়াবান ও নির্বাচিত ব্যক্তিবর্গের সাথে, আর গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সরকার গঠনে ভোট নেওয়া হয় সকল শ্রেণীর মানুষ থেকে। এ ক্ষেত্রে হিন্দু, বৌদ্ধ, ইয়াহুদি-খ্রিস্টান ও নাস্তিক সবার ভোটের সমান মূল্য হয়ে থাকে। ইসলামে মাশওয়ারায় সংখ্যাগরিষ্ঠের সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়া আবশ্যিক নয়; বরং বিষয়টি আমীরে ফায়সালের হাতে স্থগিত। তিনি চাইলে পরামর্শে গৃহীত সিদ্ধান্তের বিপরীতেও রায় দিতে পারেন। আবার চাইলে সংখ্যাগরিষ্ঠের সিদ্ধান্তের বিপরীতে কম সংখ্যক লোকের পক্ষেও রায় দিতে

পারেন। কিন্তু গণতান্ত্রিক পদ্ধতির নির্বাচনে তা কখনোই সম্ভব নয়; বরং যার পক্ষে ভোট বেশি হবে সেই নির্বাচিত হবে। আর এটাই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে। প্রকারান্তরে সংসদ সদস্যরা পার্লামেন্টে বসে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে সেটা জনগণের আবশ্যিকভাবে মেনে নিতে হয়, যদিও তা ইসলাম বিরোধী আইন হয়। কারণ, তারা জনপ্রতিনিধি ও আইন প্রণয়নের অধিকারী। কিন্তু শূরা ব্যবস্থার ক্ষেত্রে এমনটা কখনোই সম্ভব নয়।

ইসলামে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোনও সিদ্ধান্ত দিলে সেই সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে আর কোনো ভোট গ্রহণ বা মতামত গ্রহণের কোনো সুযোগ নেই। গণতান্ত্রিক ধর্মে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সিদ্ধান্তের কোনো মূল্য নেই; বরং তাগুত সরকার ও গণতান্ত্রিক নির্বাচনে নির্বাচিত তাগুত সংসদ সদস্যরা যা সিদ্ধান্ত নিবে, সেটাই জনগণের জন্য চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বলে বিবেচিত হবে। এবং তা তাদের মাঝে বাস্তবায়িত হবে। পক্ষান্তরে আল্লাহ তা'আলার দেওয়া সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে ভোট গ্রহণ করা কোনো অবস্থাতেই বৈধ নয়; বরং তা আল্লাহ তা'আলার হাকিমিয়াতকে অস্বীকার করার নামান্তর। আল্লাহ তা'আলার দেওয়া বিধান মানা হবে কি না, জনগণের মাঝে তা বাস্তবায়ন করা হবে কি না, এ মর্মে পরামর্শ করা বা ভোট দেওয়া ও নেওয়া সম্পূর্ণ হারাম ও কুফরী। এবং তা আল্লাহ দ্রোহিতার সামিল।

এক কথায় বলতে গেলে এভাবে বলতে হয় যে, গণতন্ত্রের সাথে ইসলামের সাংঘর্ষিকতা হলো মৌলিক ও অস্তিত্বগত। দুইটার অবস্থান দুই মেরুতে। দুইটা আলাদা আলাদা জীবনব্যবস্থা। গণতন্ত্রের মূল কনসেপ্ট হলো—“জনতার জন্য জনগণের তৈরি করা শাসন।” এবং “জনগণ সকল ক্ষমতার মালিক।” পক্ষান্তরে ইসলাম ও ইসলামী শাসনব্যবস্থার মূল কনসেপ্ট হলো— “আল্লাহ তা'আলাই সর্বময় ক্ষমতার মালিক। জনগণের মাঝে জনগণের তৈরি করা আইন নয়; বরং আল্লাহ তা'আলার আইন ও শাসন চলবে। তাঁর আইনই তাঁর সৃষ্টির মাঝে বাস্তবায়িত হবে।”

এ মর্মে আল্লাহ তা'আলা বলেন—

أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ

জেনে রাখো, সৃষ্টি যার শাসনও তাঁর। আল্লাহ মহান, তিনি মহা বিশ্বের পালনকর্তা।—সূরা আরাফ, আয়াত : ৫৪।

আরেক আয়াতে তিনি বলেন—

أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا

আল্লাহ তা'আলা সমস্ত শক্তির মালিক।—সূরা বাকারা, আয়াত : ১৬৫।

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম ইবনু কাসীর [মৃত্যু: ৭৭৪ হিজরী] রাহিমাহুল্লাহ বলেন—

وَأَنَّ جَمِيعَ الْأَشْيَاءِ تَحْتَ قَهْرِهِ، إِنَّ الْحُكْمَ لَهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ
وَعَالِبَتِهِ وَسُلْطَانِهِ.

শাসন কর্তৃত্ব কেবল তাঁরই, তাঁর কোনও অংশীদার নেই। আর সমস্ত বিষয়ই তাঁর কর্তৃত্ব, প্রভাব ও ক্ষমতার আওতাধীন।—অনুবাদক।

সংসদ সদস্যদের ব্যাপারে শরীআতের নির্দেশনা, আর এ ব্যাপারে রয়েছে বিশদ আলোচনা :

১. কেউ যদি সংসদে প্রবেশ করে, অর্থাৎ সংসদ সদস্য হয় এবং সে এমন বিধান প্রণয়ন করে, যা শরীআতের সাথে সাংঘর্ষিক, অথবা কেউ যদি শরীআহ বিবর্জিত আইনের সাথে একাত্মতা পোষণ করে, এবং তাতে সন্তুষ্ট হয়, কিংবা তাতে ভোট দেয় বা মতামত পেশ করে, তাহলে সে মুশরিক ও কাফির। এ ক্ষেত্রে জাহালত-অজ্ঞতা, তাওয়ীল-ব্যাখ্যা, মাসলাহাত-কল্যাণকর দিক বিবেচনা ওজর হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়।

আল্লাহ তা'আলা বলেন—

أَمْ لَهُمْ شُرَكَّاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ وَلَوْ لَا كَلِمَةُ
الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

তাদের জন্য কি এমন কিছু শরীক আছে, যারা তাদের জন্য দ্বীনের বিধান দিয়েছে, যার অনুমতি আল্লাহ দেননি? আর ফয়সালার ঘোষণা না থাকলে তাদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হয়েই যেত। আর নিশ্চয় যালিমদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।”—
সূরা শূরা, আয়াত : ২১।

إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ

বিধানদাতা একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা।”—সূরা ইউসুফ, আয়াত :
৪০।

وَلَا يَشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا

তিনি তাঁর বিধান বা সিদ্ধান্তে কাউকে অংশীদার বানান না।”—সূরা কাহফ,
আয়াত : ২৬।

২. কেউ যদি সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়ে সংসদে প্রবেশ করে এবং জেনেশুনে শরীআহ বিরোধী কুফরি সংবিধান রক্ষার শপথ গ্রহণ করে, তাহলে সে কাফির ও মুরতাদ হয়ে যাবে; চাই সে আন্তরিকতার সাথে করুক বা আন্তরিকতা ছাড়া করুক। কুফরি সংবিধান সংশোধনের নিয়তে করুক বা অন্য কোনো কারণে করুক। কারণ, সে জেনেশুনে স্বেচ্ছায় কুফরি করেছে। আর তার দৃষ্টান্ত হলো সে ব্যক্তির ন্যায়, যে ব্যক্তি লাত ও উয্যাকে সম্মান করার শপথ গ্রহণ করেছে, কিংবা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগের কুরাইশদের আইনকে সম্মান করার শপথ নিয়েছে।

৩. যদি কেউ পার্লামেন্ট মেম্বর হয়ে সংসদে প্রবেশ করে, আর সে মানবরচিত

কুফরি সংবিধানকে শ্রদ্ধা করার শপথ গ্রহণ না করে, আইন প্রণয়ন না করে, শরীআহ বিবর্জিত আইন প্রণয়নে অংশগ্রহণ না করে; বরং তা প্রত্যাখ্যান করে এবং তার বিপরীতে ভোট প্রদান করে, তাহলে তা ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম, সংশোধন ও পরিবর্তনের ক্ষেত্রে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিক নির্দেশনার বিরোধীতা করার কারণে চরম মূর্থতা ও ভ্রষ্টতা হবে। এমতাবস্থায় সে ব্যক্তি কাফির হবে না, যদিও সে ভ্রষ্টতা ও শিরকের পথকে গ্রহণ করেছে দাওয়াত, বিপ্লব ও সংশোধনের উদ্দেশ্যে।

এ মর্মে আল্লাহ তা'আলা বলেন—

فَذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّى تُصْرِفُونَ

অতএব, তিনিই আল্লাহ, তোমাদের প্রকৃত রব। অতঃপর সত্যের পর ভ্রষ্টতা ছাড়া কী থাকে? অতএব কোথায় তোমাদেরকে ঘুরানো হচ্ছে?”—সূরা ইউনুস, আয়াত : ৩২।

“প্রকৃত বাস্তবতা হলো কুফরি সিস্টেমের ভিতরে ঢুকে কখনোই তা পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। কারণ, গণতান্ত্রিক কুফরি সিস্টেমের বেশ কিছু সীমাবদ্ধতা ও বাধ্যবাধকতা রয়েছে, যা আপনি ইচ্ছা করলেই অমান্য করতে পারবেন না। পরিবর্তনও করতে পারবেন না। তা ছাড়া আপনি যদি উপরিউক্ত তৃতীয় পথটি বেছে নেন, তাদের সবকিছুর বিরোধীতা করেন এবং তাদের কুফরি সংবিধান রক্ষার শপথ গ্রহণ না করেন, তাহলে কখনোই আপনাকে সংসদে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না। বরং সংসদ অবমাননার অভিযোগে অভিযুক্ত করে শাস্তির আওতায় নিয়ে আসা হবে। সংসদ থেকে বহিস্কার করা হবে। তখন আপনি গণতন্ত্রের ধর্ম মতে ‘মুরতাদ’ বলে বিবেচিত হবেন, যার একমাত্র শাস্তি ‘মৃত্যুদণ্ড’।

স্মর্তব্য, গণতন্ত্র এমন একটি স্বতন্ত্র ধর্ম ও প্রতারণাপূর্ণ জীবন পদ্ধতি, যার মাধ্যমে খুব কমই ভালো কাজের বাস্তবায়ন করা হয়। আর গণতন্ত্রের মাধ্যমে শরীআহ বাস্তবায়ন তো কল্পনাভীত বিষয়। গণতন্ত্রের মৌলিক একটি কনসেপ্ট হলো

‘সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের রায়ের’ ভিত্তিতে শাসন কার্য পরিচালনা করা। আর সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষই প্রবৃত্তির অনুসারী হয়ে থাকে। আপন মনের দাসত্ব করে থাকে। তা ছাড়া সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষই জাহিল, ফাসিক, কাফির ও মুশরিক। প্রকারান্তরে মানুষ যখন নববী পদ্ধতির বিপরীত কাজ করে, মুমিনদের পথ ছেড়ে অন্যান্য পথের অনুসরণ করে, তখন অনিবার্য ফিতনা তাদের গ্রাস করে ফেলে। এবং অনিচ্ছা সত্ত্বেও ঈমানের পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে কুফরিতে লিপ্ত হয়ে পড়ে।

এ মর্মে আল্লাহ তা’আলা বলেন—

عَذَابٌ يُصِيبُهُمْ أَوْ فِتْنَةٌ تُصِيبُهُمْ أَنْ أَمْرَهُمْ عَنْ يُذَالِفُونَ الَّذِينَ فَلْيَحْذَرِ
الْإِيم

অতএব যারা তাঁর নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ করে তারা যেন কুফর-শিরকে আক্রান্ত হওয়ার অথবা যন্ত্রণাদায়ক আযাবে পৌঁছার ব্যাপারে ভয় করে।”—সূরা নূর, আয়াত : ৬৩।

তিনি আরও বলেন—

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ
الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا

আর যে রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে তার জন্য হিদায়াত প্রকাশ পাওয়ার পর এবং মুমিনদের পথের বিপরীত পথ অনুসরণ করে, আমি তাকে ফেরাব যেদিকে সে ফিরে এবং তাকে প্রবেশ করাব জাহান্নামে। আর আবাস হিসেবে তা খুবই মন্দ।”—সূরা নিসা, আয়াত : ১২৫।

এখানে কারও কারও মনে একটি প্রশ্ন জাগতে পারে যে, কেউ যদি সংসদে গিয়ে আল্লাহ তা’আলার আইনকেই সাংবিধানিকভাবে বা সংসদীয় উপায়ে বাস্তবায়ন করে, তাহলে তার হুকুম কী হবে? সে কি প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণীর মতোই কাফির

হবে?

এ ক্ষেত্রে প্রথম কথা হলো— ইসলামী আইন প্রণয়ন করার বিষয় নয়; বরং তা বাস্তবায়ন করার বিষয়। আল্লাহ তা'আলা বিধান দিয়েছেন, তাঁর বিধানই তাঁর সৃষ্টির মাঝে বাস্তবায়িত হবে। তাঁর বিধানকে পিছনে ফেলার বা পুনর্বিচার করার অধিকার কারো নেই।

আল্লাহ তা'আলা বলেন—

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

তারা কি দেখে না, আমি যমীনকে চতুর্দিক থেকে সংকীর্ণ করে আনছি। আর আল্লাহই বিধান দেন এবং তাঁর বিধানকে পুনর্বিবেচনা করার কেউ নেই এবং তিনিই দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।”—সূরা রা'আদ, আয়াত : ৪১।

তা ছাড়া আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল কোনও বিষয়ে ফয়সালা দিলে মুমিন বান্দা ও বান্দীদের কোনো ইচ্ছাধীকার থাকে না। মন চাইলে মানবে আর না চাইলে প্রত্যাখ্যান করবে, এ সুযোগ নেই। বরং তা আবশ্যিকভাবে মেনে নিতে হবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন—

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا

আর আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোন নির্দেশ দিলে কোন মুমিন পুরুষ ও নারীর জন্য নিজদের ব্যাপারে অন্য কিছু এখতিয়ার করার অধিকার থাকে না; আর যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অমান্য করল সে স্পষ্টই পথভ্রষ্ট হবে।”—সূরা আহযাব, আয়াত : ৩৬।”

গণতন্ত্রের আদলে সংসদ সদস্যদের মতামতের ভিত্তিতে যদি কখনো কোনো ইসলামী আইন বাস্তবায়িত হয়েও যায়, তবুও তাতে সন্দেহ বা খুশি হওয়ার কিছু নেই। কারণ, তখন সেটা আল্লাহ তা'আলার আইন হিসেবে বাস্তবায়িত হয়নি; বরং গণতন্ত্রের আইন হিসেবে বাস্তবায়িত হয়েছে। গণতন্ত্রের স্বার্থ বিরোধী হয়নি বলেই এই আইনের বাস্তবায়ন করা হয়েছে। সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ চেয়েছে বিধায় সেটা সংসদীয় পদ্ধতিতে বৈধতা পেয়েছে। অথচ আল্লাহ তা'আলার আইন এসবের মুখাপেক্ষী নয়। জনগণের রায়ের ভিত্তিতে বাস্তবায়িত হওয়ার নয়। আল্লাহ তা'আলার দেওয়া বিধান মানা না মানার ইখতিয়ার কারো নেই। জনগণ চাইলে আল্লাহ তা'আলার আইন বাস্তবায়িত হবে, না চাইলে হবে না— ব্যাপারটি মোটেও সেরকম নয়; বরং আল্লাহ তা'আলার আইনই চূড়ান্ত। এটা বাস্তবায়িত হওয়ারই ছিল; এতে কারও সমর্থন থাকুক বা থাকুক। সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ তা চাক বা না-চাক; অধিকাংশ মানুষ তা মানুক বা না মানুক।

মূল কথা হলো- তাশরী (আইন প্রণয়ন করা) একমাত্র আল্লাহ তা'আলার কর্মগত গুণ। এতে যে কেউ যেকোনো উপায়েই অংশগ্রহণ করুক, সে আল্লাহর সাথে নিজেকে অংশীদার সাব্যস্ত করার কারণে মুশরিক হয়ে যাবে। এবং অবস্থাভেদে তাগুত হিসেবে বিবেচিত হবে।

এখানে আরেকটি সমসাময়িক বিষয় নিয়ে আলোচনা করা মুনাসিব মনে করছি— সেটি হলো, আমাদের মাঝে অনেক দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ আছেন, যারা শিরকের আখড়া সংসদে দাওয়াত দিতে ও দাওয়াতের পরিবেশ তৈরি করার নিয়তে প্রবেশ করতে চান। অনুরূপভাবে একই উদ্দেশ্যে শির্কি শাসনব্যবস্থা বা প্রশাসনে প্রবেশ করতে চান, এবং সেকুলারদের সাথে মৈত্রীবন্ধন ও সখ্যতা গড়ে তুলতে, অথবা রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলের জন্য তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চান। সে জন্য অনেকে আশ্রয় ও নিরন্তর চেষ্টাও করে যাচ্ছেন। যদিও বাহ্যিকভাবে তাদের এই চেষ্টা এবং চেতনা সুন্দর ও সঠিক মনে হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা সঠিক নয়; বরং আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত। ঈমান বিধ্বংসী কাজ। এই বিষয়টি বোঝার জন্য একটা

উদাহরণ দিই, যাতে বিষয়টি সবার সামনে পরিষ্কার হয়ে যায়।

যেমন ধরুন, বিগত ষোল বছর বাংলাদেশে পতিত আওয়ামীলীগ সরকার তিনবার নির্বাচন দিয়েছে। প্রতিবারই তারা নিজেদের হাতে ক্ষমতা রেখে তত্ত্বাবধায়ক সরকারবিহীন ডামি নির্বাচনের আনুষ্ঠানিক আয়োজন করেছে, যা ছিল সম্পূর্ণ অবৈধ প্রক্রিয়া। যার ফলে প্রধান বিরোধী দল বিএনপি এই নির্বাচন বর্জন করেছে। অবৈধ প্রক্রিয়ার ডামি নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করে তারা এটা প্রমাণ করেছে যে, এই নির্বাচন বৈধ নয় এবং বৈধ প্রক্রিয়ায়ও হয়নি।

নির্বাচনে অংশগ্রহণ করলে নিশ্চয়ই হারজিত একটা কিছু হতো, কিন্তু তখন তারা আর এ কথা বলতে পারতো না যে, অবৈধ পন্থায় নির্বাচন দিয়েছে ফ্যাসিস্ট সরকার। অতএব এটা বৈধ নির্বাচন নয়। অনুরূপভাবে আপনি যখন কোনো অবৈধ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করবেন, যদিও তা ভালো উদ্দেশ্যে হোক, তখন আপনি আর এ কথা বলতে পারবেন না যে, উক্ত প্রক্রিয়া বৈধ প্রক্রিয়া নয়; বরঞ্চ উল্টো আপনি তাদের সাথে একাত্মতা পোষণ করলেন যে, উক্ত অবৈধ পদ্ধতি অবৈধ নয়; বরং তা বৈধ। এ ক্ষেত্রে আপনি নিজেও তাকে পরোক্ষভাবে সমর্থন করলেন এবং তার বৈধতার স্বীকৃতি দিলেন। অথচ তা মোটেও উচিত নয়। সুতরাং দাওয়াতের নিয়তেও কুফরি গণতন্ত্রের শিকি প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করা যাবে না। মুশরিকদের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করা যাবে না; বরং তাদের সাথে বারাতাত তথা সম্পর্কচ্ছেদ করাই ঈমানের মৌলিক ও বলিষ্ঠ দাবি।

এ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলার বাণী—

قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي ۖ أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ ۖ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي
وَسُبْحَنَ اللَّهِ ۖ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ

হে নবী আপনি বলুন, 'এটি আমার পথ। আমি দৃঢ় বিশ্বাস ও প্রমাণসহ আল্লাহর দিকে আহ্বান করি এবং যারা আমার অনুসারী তারাও (এভাবেই দাওয়াত দেয়)। এবং আল্লাহ তা'আলার সত্তা পবিত্র ও মহান। আর আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত

নই।”-সূরা ইউসুফ, আয়াত : ১০৮।

দাওয়াত আমাদের দিতে হবে। দাওয়াত সবার কাছে পৌঁছাতে হবে। তবে তা মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে নয়, তাদের অনুসরণ করে নয়; বরং তাদের বর্জন করে, তাদের প্রতি ঘৃণা রেখে তাদের থেকে বিমুখতা প্রকাশ করে।

এ ব্যাপারে আল্লাহ তা’আলা বলেন-“

فَأَصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ

সুতরাং তোমাকে যে আদেশ দেয়া হয়েছে, তা ব্যাপকভাবে প্রচার কর এবং মুশরিকদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও।”-সূরা হিজর, আয়াত : ৯৪।

তা ছাড়া যেখানে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে এবং তাদের সিদ্ধান্তের সাথে তামাশা করা হচ্ছে, শরীআহ বিবর্জিত কাজ করা হচ্ছে, আল্লাহ তা’আলার হাকিমিয়াতে শরীক করা হচ্ছে, সেখানে না থাকা এবং সেসব জায়গা বর্জন করাই শরীআহর নির্দেশ। এমতাবস্থায় যদি আমরা তা বর্জন না করি, তাহলে আমরাও তাদের মতোই হয়ে গেলাম। তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেলাম।

এ মর্মে আল্লাহ তা’আলা বলেন-“

وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ إِنَّكُمْ إِذَا مِثْلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا

আর তিনি তো কিতাবে তোমাদের প্রতি নাযিল করেছেন যে, যখন তোমরা শুনবে আল্লাহর আয়াতসমূহ অস্বীকার করা হচ্ছে এবং সেগুলো নিয়ে উপহাস করা হচ্ছে, তাহলে তোমরা তাদের সাথে বসবে না, যতক্ষণ না তারা অন্য কথায় নিবিষ্ট হয়, তা না হলে তোমরাও তাদের মত হয়ে যাবে। নিশ্চয় আল্লাহ মুনাফিক ও কাফিরদের সকলকে জাহান্নামে একত্রকারী।”-সূরা নিসা, আয়াত : ১৪০।

আরেক আয়াতে তিনি বলেন—

وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ

আর যখন তুমি তাদেরকে দেখবে, যারা আমার আয়াতসমূহের ব্যাপারে উপহাসমূলক সমালোচনায় রত আছে, তুমি তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও, যতক্ষণ না তারা অন্য কথাবার্তায় লিপ্ত হয়। আর যদি শয়তান তোমাকে ভুলিয়ে দেয়, তাহলে মনে পড়ার পর যালিম সম্প্রদায়ের সাথে আর বসো না।”—
সূরা আন'আম, আয়াত : ৬৮।

পরিশেষে একটা কথা বলা জরুরি মনে করছি যে—সহীহ নিয়তে, ইখলাসের সাথে কোনও কিছু করলেই সেটা বৈধ ও গ্রহণযোগ্য হয় না। বরং তা বৈধ পন্থায় করতে হয়। সহীহ নিয়তে যিনা যেমন বৈধ নয়, তেমনিভাবে সহীহ নিয়তে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করাও বৈধ নয়। সহীহ নিয়তে ইখলাসের সাথে সুদ দেওয়া নেওয়া যেমন বৈধ নয়, তেমনি গণতন্ত্রও বৈধ নয়। নামাযের নিয়তে পেশাব দিয়ে পবিত্রতা অর্জন যেমন, ইসলাম প্রতিষ্ঠার নিয়তে গণতন্ত্র করাও সেরকম। কূপে মৃত ও পঁচা প্রাণী রেখে হাজার হাজার বালতি পানি তুলে ফেললেও কূপের পানি পবিত্র হবে না। আগে সেই মৃত ও পঁচা প্রাণীটিকে কূপ থেকে উঠিয়ে ফেলতে হবে। অনুরূপভাবে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে হলে শুধু ইসলাম প্রতিষ্ঠার ব্যানারে চেষ্টা করলেই হবে না, তার আগে কুফর ও শির্ক থেকে দায়মুক্ত হতে হবে। এসবের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করতে হবে। গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ, উদারতাবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ থেকে বেঁচে থাকতে হবে। সকল কুফরি মতবাদের ব্যাপারে সচেতন হতে হবে। মনে রাখতে হবে ঈমান সবার আগে, ঈমানের জলাঞ্জলি দিয়ে দ্বীন কায়েম করা আদৌ সম্ভব নয়।”—
অনুবাদক।

اللَّهُمَّ ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه
آمين يارب ،واجعلنا من المجاهدين و الشهداء و الصالحين
العالمين

সমাপ্ত